ইউনিট ২৩

মাছের রোগ বালাই

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। জাতীয় আমিষ চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে এদেশে আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন সহজ বিকল্প নেই। মাছের রোগ বালাই বাংলাদেশে আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নে অন্যতম অন্তরায়। রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু পানির দূষিত পরিবেশে মাছকে আক্রমন করলে মাছের রোগ দেখা দেয়। পানির দূষিত পরিবেশ বা পারিবেশিক পীড়ণ মাছকে অধিকতর সংবেদনশীল করে তোলে। ফলে মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই রোগ বালাই থেকে মাছ, মাছের পোনাকে রক্ষা করে উৎপাদন বাড়াতে হলে রোগের কারণ, লক্ষণ এবং বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মাছের রোগ, রোগের কারণ, লক্ষণসমূহ, মাছের ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগ, উদর রোগ, পরজীবি ঘটিত রোগ, কৃমি রোগ এবং অপুষ্টি জনিত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২৩.১

মাছের রোগ, রোগের কারণ এবং লক্ষণসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- মাছের রোগের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

প্রাণী মাত্রই বিভিন্ন রোগের শিকার হয়, মাছও এর ব্যতিক্রম নয়। মাছের রোগ হল পোষকের সর্বানুকূল জলজ পরিবেশের অবনতির কারণে সৃষ্ট পীড়ণ, কার্যকরী রোগজীবাণু এবং পোষকের দেহে স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির আন্তক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ, চিহ্ন বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

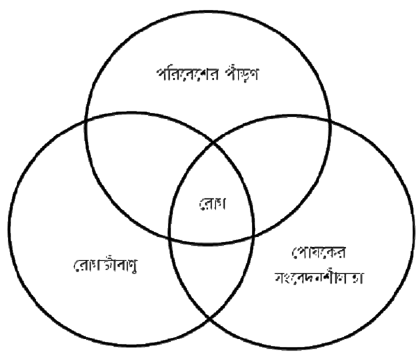

রোগের কারণ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগজীবাণু এবং মাছের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। মাছের রোগের চিহ্নিত কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

> সংবেদনশীল মাছ, পরিবেশ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর আন্ত ক্রিয়ার দরুন রোগের সৃষ্টি হয়।

- জলাশয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
- পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুনের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পি এইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি)।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ।
- বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ।
- অধিক মজুদ ঘনত্ব।
- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব।

- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন এবং হ্যান্ডেলিং।
- পরজীবি ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর (যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) সংক্রমণ।
- পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব।
- জলাশয়ে রাক্ষুসে প্রাণীর (উদ, ব্যাঙ ও সাপ ইত্যাদি) উপস্থিতি।
- পুকুরে অতিরিক্ত কাদা থাকলে।
- পুকুরে জলজ আগাছার আধিক্য।
- অন্য জলাশয়ে ব্যবহৃত জাল শোধন না করে ব্যবহার করলে।
- যানবাহন, শিল্প কারখানার বর্জ্য, কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক পানিতে এসে পানি দুষণের ফলে মাছ রোগাক্রান্ত হয়।

  নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

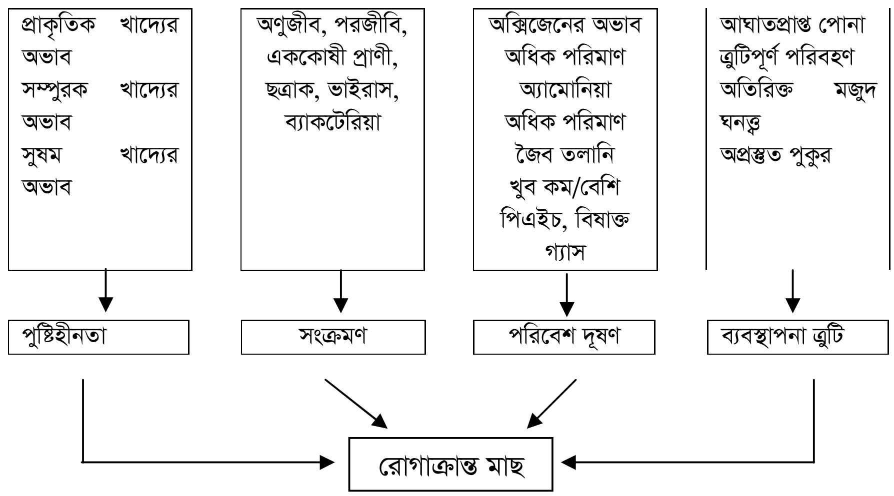

রোগের কারণ এবং মাছের মড়কের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পানির পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলে মাছের মৃত্যুহার অধিক হয় এবং মাছ দ্রুত মারা যায়। মাছের মড়কের অন্যান্য কারণ যেমন- রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, পুষ্টির অভাব ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি।

রোগের লক্ষণসমূহ

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবির আক্রমনের ধরণ অনুযায়ী রোগাক্রান্ত মাছে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা দেয়। তবে সাধারনভাবে রোগাক্রান্ত মাছের মধ্যে যেসব লক্ষণ ও আচরণ বেশী দেখা যায় সেগুলো হলো-

- মাছ দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ছন্দহীনভাবে পানির উপর সাঁতার কাটে।
- খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয় বা একেবারে বন্ধ করে দেয়।
- মাছ সম্পুরক খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখায়।
- মাছের ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে।
- পানির উপরে ভেসে খাবি খায়।
- ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়।
- দেহের ওপর লাল/ কালো/ সাদা দাগ পড়ে।
- দেহে বিজল থাকে না, দেহ খসখসে হয়ে যায়।
- মাছ পানিতে ডুবন্ত কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে।
- চোখ ফুলে যায় বা বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।

- গায়ে রক্তক্ষরণ বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- লেজ ও পাখনার পচন ধরে।
- ফুলকা পচে যায়।
- মাছের ত্বকে তুলার ন্যায় ছত্রাক দেখা যায়।
- ফুলকায় সাদা বা কালো দাগ বা সিস্ট দেখা যায়।
- মাছের পেট ফুলে যায়।
- দেহের তুলনায় মাথা বড় হয়।
- মাছের দেহ গহবরে ঘোলাটে, সাদা বা পরিস্কার তরল জমা হয়।
- রোগাক্রান্ত মাছের খাদ্যনালীতে রক্তক্ষরণ হয়।
- আইশের গোড়া, ত্বক, পায়ুপথ বা ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়।
- দেহের বর্ধনহার কমে যায়।
- হঠাৎ ব্যাপকহারে মাছের মড়ক দেখা দেয়।

সারমর্মঃ

শিল্পায়নের ফলে বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যানবাহন, শিল্প কারখানার বর্জ্য, কৃষিজমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক পানিতে এসে পড়ায় পানি দূষণ হয় ফলে মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। জলজ পরিবেশ, মাছ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর আন্তক্রিয়ার দরুন রোগের সৃষ্টি হয়, যা মাছের দেহে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ও অস্বাভাবিক আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায়। এছাড়াও অপুষ্টি, অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ এবং বংশানুক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের সৃষ্টি হয়। পুকুরে মাছের রোগের আক্রমন হলে উৎপাদন লক্ষমাত্রায় পৌছানো সম্ভব নয়। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য চাষ ও পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি মাছের রোগ সৃষ্টির কারণ নয়?
ক) পোষকের সংবেদনশীলতা খ) পরিবেশগত পীড়ন
গ) রোগজীবাণু ঘ) মাছ চাষ পদ্ধতি

২। নিচের কোনটি সঠিক নয়?
ক) রোগাক্রান্ত মাছে কোন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না
খ) পরিবেশগত পীড়নে মাছের মৃত্যুহার কম হয়
গ) মাছের সব রোগেই একই লক্ষণ প্রকাশ পায় না
ঘ) রোগাক্রান্ত মাছের বর্ধনহার কমে যায়

৩। কোনটি রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণ নয়?
ক) পেট ফুলে যাওয়া
খ) ত্বকে ক্ষত, রক্তক্ষরণ এবং পচন হওয়া
গ) ভয় দেখালে দ্রুত পানির নিচে চলে যায়
ঘ) মাছের চোখ বের হয়ে আসে

৪। পরিবেশগত পীড়নের ফলে কোনটির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়?
ক) মাছ খ) রোগজীবাণু
গ) জলজ আগাছা ঘ) জলজ জীব

উত্তরমালাঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। খ

পাঠ ২৩.২

মাছের ক্ষত রোগ, লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের ক্ষত রোগ কী এবং কেন হয় তা জানতে পারবেন।
- মাছের ক্ষত রোগের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ কী তা জানতে পারবেন।
- লেজ ও পাখনা পঁচা রোগের লক্ষণ বলতে পারবেন।

মাছের ক্ষত রোগ

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে প্রথম এ রোগে মাছ আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। তবে ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে এ রোগ দেখা দেয় পরে তা নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্পুচিয়া, লাওস, মায়ানমার, ফিলিপাইন এবং শ্রীলংকা হয়ে এ রোগ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে।

রোগ জীবাণু

মাছের ক্ষত রোগ প্রথমে ভাইরাস এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমনের ফলে সৃষ্টি হয়।

ক্ষত রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে কয়েকটি দেশে বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তা সত্ত্বেও নিশ্চিত করে কোন নির্দিষ্ট কারণ এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এ্যাপানোমাইসেস (*Aphanomyces*) নামক এক প্রকার ছত্রাক জলজ পরিবেশের বিশেষ অবনতিতে এ রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়াও অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, মাছের ক্ষত রোগ প্রথমে ভাইরাস এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমনের ফলে সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ক্ষতরোগে আক্রান্ত মাছসমূহ থেকে নিম্নোক্ত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসসমূহ শনাক্ত করা হয়েছে-

ব্যাকটেরিয়াঃ

অ্যারোমনাস হাইড্রোফিলা (*Aeromonus hydrophila*)
অ্যারোমনাস পাংটেটা (*Aeromonus punctata*)
ফ্লেভোব্যাকটেরিয়াম (*Flavobacterium* sp.)
সিউডোমনাস (*Pseudomonus* sp.)
স্ট্রেপটোকক্কাস (*Streptococcus* sp.)
ভিবরিও এনকুইলেরাম (*Vibrio anquillarum*)
বিভিন্ন মাছে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেলেও *Aeromonus hydrophila* -ই সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেছে।

ভাইরাসঃ

র‌্যাবডোভাইরাস (*Rhabdovirus*)
বির্না ভাইরাস (*Birna virus*)
রিও ভাইরাস (*Reo virus*)
পিকর্না ভাইরাস (*Picorna virus*)

অনেক বিজ্ঞানী ভাইরাসকে এ রোগের কারণ বলে মনে করেন। *Rhabdovirus* কেই ক্ষত শুরু করার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

ছত্রাক

সাধারনত *Saprolegnia* প্রজাতির ছত্রাক মাছের ক্ষতস্থানে পাওয়া যায়, তবে *Achla* sp. ও কোন কোন মাছে দেখা গেছে। ছত্রাক এ রোগের জন্য দায়ী নয় বলে প্রায় সকল রোগ বিশেষজ্ঞই একমত। সাধারণত কোন মাছ আক্রান্ত হওয়ার পরে এটি তার গায়ে সংযুক্ত হয়।

রোগের বিস্তার

কম তাপমাত্রা ও জলাশয়ের বিরূপ পরিবেশের কারণে ক্ষত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

এ দেশের আভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় সব প্রজাতির মাছ কম বেশী এ রোগে সংবেদনশীল। এদেশের ৩২ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছে এ রোগ দেখা যায়। বাংলাদেশের যেসব মাছে এ রোগ দেখা দিয়েছে তা হলোঃ শোল, টাকি, গজার, পুঁটি, বাইম, খলিসা, আইড়, কুচিয়া, শিং, মাগুর, কৈ, টেংরা, বোয়াল, চিতল, মেনি, মলা ইত্যাদি মাছ। তবে শোল, টাকি, গজার, পুঁটি ও বাইম মাছই সর্বাধিক আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। কম তাপমাত্রায় ও জলাশয়ের বিরূপ পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পানির গুনাগুণের অবনতি ঘটে যেমন-

- হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যাওয়া (১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কম)
- পি এইচ কমে যাওয়া (৪-৬)
- ক্ষারকত্ব হ্রাস পাওয়া (৪৫-৭৪ পিপিএম)
- ক্লোরাইড এর স্বল্পতা (৩-৬ পিপিএম)
- হার্ডনেস তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়া

শীতকালের প্রারম্ভ থেকে বর্ষা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত এ রোগের সংক্রমণ চলতে থাকে। কম বৃষ্টিপাতে এ রোগের সংক্রমনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

রোগের লক্ষণ

- প্রাথমিকভাবে মাছের গায়ে লাল দাগ দেখা যায় এবং পরে ঐ স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- মাছ অস্বাভাবিকভাবে পানির উপরিস্তরে সাঁতার কাটতে থাকে। মাঝে মাঝে পানির উপরে মাথা বের করে লাফ দিয়ে উঠে।
- মাছ অস্বাভাবিক ও নিষ্ক্রিয়ভাবে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে।
- আক্রান্ত মাছ খাদ্য গ্রহণ করে না।
- আক্রান্ত মাছের লেজ ও পাখনা খসে পড়ে।
- আক্রান্ত স্থানে ঘা হয় এবং পুঁজ ও তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়।
- রোগাক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যায়।

লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ

রোগজীবাণু

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগ সাধারণত: সিউডোমোনাস ও মিক্সো ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার

রুই জাতীয় মাছ, শিং, মাগুর ও পাংগাস মাছে এ রোগ দেখা দেয়। পানির পিএইচ ও ক্ষরতার স্বল্পতা দেখা দিলে এ রোগ দেখা দিতে পারে। সাধারণত: গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। একবার পুকুরে এ রোগ দেখা দিলে সংক্রমিত হয়ে সব মাছ মারা যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

রোগের লক্ষণ

- মাছের দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়।
- আক্রান্ত স্থানে তুলার মত ছত্রাক জন্মায়।
- লেজ ও পাখনায় সাদাটে দাগ সৃষ্টি হয়।
- মাছ খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখায়।
- লেজ ও পাখনার পর্দা ছিড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- মাছ ভারসাম্যহীনভাবে চলাফেরা করে।
- মাছের রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ও রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

অনুশীলনী (Activity) ঃ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে সব প্রজাতির মাছে ক্ষত রোগ দেখা দিয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। ক্ষত রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।

সারমর্মঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় সব প্রজাতির মাছ কম বেশী ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথম পর্যায়ে ভাইরাস এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমনে এ রোগ সৃষ্টি হয়। কম তাপমাত্রা ও জলাশয়ের বিরূপ পরিবেশে এ রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায়। অপরদিকে লেজ ও পাখনা পঁচা রোগটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। কার্প ও ক্যাটফিশ মাছে এ রোগ বেশী দেখা দেয়। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এ সমস্ত রোগ চাষকৃত মাছকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে পারে। পুকুরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ করে পানিতে পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ করে মাছের ক্ষত রোগ এবং লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লেজ ও পাখনা পচা রোগের জীবাণু কোনটি?
ক) ভাইরাস খ) ব্যাকটেরিয়া
গ) পরজীবি ঘ) ছত্রাক

২। সর্বপ্রথম কোন দেশে মাছে ক্ষত রোগ দেখা দেয়?
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) ফিলিপাইন
গ) শ্রীলংকা ঘ) অস্ট্রেলিয়া

৩। বাংলাদেশে কত সালে ক্ষত রোগ প্রথম দেখা দেয়?
ক) ১৯৬৮ খ) ১৯৭৮
গ) ১৯৮৮ ঘ) ১৯৯৮

৪। কোন ধরনের মাছে ক্ষত রোগের প্রকোপ বেশী পরিলক্ষিত হয়?
ক) রুই খ) পোনা মাছ
গ) তেলাপিয়া ঘ) শোল

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ ২৩.৩

ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগ, উদর রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগ কেন হয় তা জানতে পারবেন।
- ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগের বিস্তার ও লক্ষণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- উদর রোগ কি এবং কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উদর রোগের বিস্তার এবং লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগ

এককোষী পরজীবিঘটিত রোগের মধ্যে এ রোগের প্রার্দুভাব পোনা মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। নার্সারী পুকুরের পোনা মাছে এ রোগ বেশী দেখা যায়।

রোগজীবাণু

ট্রাইকোডিনা নামক এককোষী পরজীবির কারণে ফুলকা পঁচাও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব পোনা মাছে দেখা যায়।

ট্রাইকোডিনা জাতীয় পরজীবির কারনে এ রোগ দেখা যায়। যথা– ট্রাইকোডিনা ডুমারগুই (*Trichodina domerguei*), ট্রাইকোডিনা পেডিকুলাস (*T. pediculus*), ট্রাইকোডিনা নিগ্রা (*T. nigra*) ইত্যাদি। ট্রাইকোডিনা প্রধানত মাছের ফুলকাকে আক্রান্ত করে। ফুলকায় হলুদ রংয়ের ক্ষুদ্রাকার গুটি দেখা যায়। ফলে একে বসন্ত রোগ বলে।

রোগের বিস্তার

ধানী পোনা ও আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট ও অগভীর জলাশয়ে এবং পানির গুণাগুন খারাপ হলে পোনা মাছ এ রোগে বেশী সংক্রমিত হয়। এ রোগে পোনা মাছে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়। রুই জাতীয় মাছের পোনা বিশেষ করে গ্রাস কার্পের পোনা এ রোগের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। আক্রান্ত মাছের স্পর্শে এবং পানির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। প্রাপ্ত বয়স্ক মাছ এ রোগের বাহক। মে-আগষ্ট মাসে পানির তাপমাত্রা যখন বেশী থাকে তখন এ পরজীবির আক্রমন বেড়ে যায়।

রোগের লক্ষণ

- মাছের ফুলকার উপর প্রথমে দু-এক জায়গায় হালকা হলুদ রংয়ের ক্ষুদ্রাকার গুটি বা দাগ দেখা দেয়।
- আক্রান্ত মাছের ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়।
- মাছ অস্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটে।
- পোনা মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।
- ফুলকারশ্মিতে (Gill filament) পচন ধরে এবং ফুলকা শলাকা (Gill racker) বের হয়।
- মাছ দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকে।
- আক্রান্ত পোনা মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দ্রুত মারা যায়।

উদর রোগ

অ্যারোমোনাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার কারণে মাছ উদর রোগের প্রার্দুভাব ঘটে।

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগকে পেট ফোলা বা ইংরেজীতে Dropsy বলা হয়।

রোগজীবাণু ঃ

অ্যারোমোনাস জাতীয় এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া এ রোগের প্রধান কারণ।

রোগের বিস্তার

এ দেশের স্বাদুপানির প্রায় সব মাছেই এ রোগ কিছু কিছু দেখা যায়। তবে কার্প ও ক্যাটফিশে এ রোগ বেশী দেখা যায়। পুকুরের পানির পরিবেশ খারাপ হলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। চাষকৃত জলাশয়ে সুষম খাদ্যের অভাবে মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। পুকুরে অতিরিক্ত ঘনত্বে মাছ মজুত এ রোগের একটি অন্যতম সহায়ক কারণ।

রোগের লক্ষণ

- আক্রান্ত মাছের বক্ষ গহবরে তরল পদার্থ জমে এবং তা বেশ ফুলে যায়।
- মাছের দেহের রং ফ্যাকাশে হয় ও স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারায়।
- মাছ ভারসাম্যহীনভাবে চলাফেরা করে।
- মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়।
- মাছের দেহ থেকে মিউকাস/বিজল নি:সৃত হয়।
- চোখ বের হয়ে আসে।
- আঁইশ ঢিলা হয়ে যায় ও ফুলে উঠে।
- পেটে চাপ দিলে মলদ্বার দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।
- মাছ ধীরে ধীরে মারা যায়।

অনুশীলনী (Activity) ঃ কোন কোন মাছে ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগ বেশী দেখা দেয় এবং এই রোগগুলো প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।

সারমর্মঃ

নার্সারী পুকুরে পোনা মাছে ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগ দেখা যায়। ট্রাইকোডিনা নামক এককোষী পরজীবির সংক্রমনে এ রোগ হয়। নার্সারী পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত পোনা মজুত করলে এবং জলাশয়ের বিরূপ পরিবেশে এ রোগ হয়। রোগাক্রান্ত মাছের ফুলকায় গোলাকার ছোট গুটি বা দাগ দেখা যায়। অ্যারোমোনাস জাতীয় একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমনে উদর রোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত মাছের বক্ষ গহবরে তরল পদার্থ জমে পেট ফুলে যায়। মাছের দেহের রং ফ্যাকাশে হয় ও স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারায়। দেহের ভারসাম্য হারায় এবং মাছ ধীরে ধীরে মারা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগের জীবাণু?
ক) মিক্সোকক্কাস
খ) ট্রাইকোডিনা
গ) অ্যারোমোনাস
ঘ) ড্যাকটাইলোগাইরাস

২। কোন ধরনের মাছে ফুলকা পঁচা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ বেশী পরিলক্ষিত হয়?
ক) ক্যাটফিশ
খ) পোনা মাছে
গ) ব্রুড মাছে
ঘ) বড় মাছে

৩। ট্রাইকোডিনা কী?
ক) এককোষী পরজীবি
খ) বহুকোষী পরজীবি
গ) ব্যাকটেরিয়া
ঘ) ভাইরাস

৪। উদর রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম কী?
ক) অ্যারোমোনাস
খ) আরগুলাস
গ) ইকথায়োপথিরিয়াস
ঘ) ড্যাকটাইলোগাইরাস

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ক

পাঠ ২৩.৪

পরজীবিঘটিত রোগ, কৃমি রোগ এবং অপুষ্টিজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন পরজীবিঘটিত রোগের নাম বলতে পারবেন।
- কার্পজাতীয় মাছের পরজীবিঘটিত রোগের লক্ষণ এবং কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃমি রোগের লক্ষণ ও কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মাছের বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিজনিত রোগ বালাই সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পরজীবিঘটিত রোগ

জলজ পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতি পরজীবিঘটিত রোগের প্রধান কারণ।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে পরজীবিঘটিত রোগের সংক্রমণ অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত রোগের চেয়ে অধিক লক্ষ্য করা যায়। কার্পজাতীয় মাছে পরজীবিঘটিত রোগের প্রকোপ বেশী পরিলক্ষিত হয়। মাছের পরজীবিঘটিত রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আরগুলোসিস, সাদা দাগ রোগ, মিক্সোবোলিয়াসিস, ট্রাইকোডাইনিয়াসিস ইত্যাদি।

আরগুলোসিস

মাছের উকুন রোগ একটি পরজীবিজনিত রোগ।

এই রোগটি সাধারণভাবে মাছের উকুন রোগ নামে পরিচিত। মাছের উকুন রোগ একটি পরজীবিজনিত রোগ। আরগুলাস নামক এক প্রকার পরজীবির দ্বারা প্রধানত ব্রুড মাছে এ রোগ দেখা যায়।

রোগজীবাণু

আরগুলাস গনের কয়েক প্রজাতির পরজীবি এই রোগ সৃষ্টি করে। যথা- আরগুলাস ফলিয়াসিয়াস (*Argulus folieaceus*), আরগুলাস করিগনি (*A. coregoni*)।

রোগের বিস্তার

কার্পজাতীয় দেশী ও বিদেশী সব প্রজাতির মাছে এ রোগের সংক্রমন লক্ষ্য করা যায়। বহুকোষী পরজীবিঘটিত রোগের মধ্যে আরগুলোসিস মাছের প্রধান রোগ। মাছের জীবনচক্রের সব দশাতেই এ পরজীবির সংক্রমন ঘটে থাকে। পরিপক্ক ও প্রজননক্ষম ব্রুড মাছ এ রোগে আক্রান্ত হলে মাছের ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুনের অবনতি এবং অধিক মজুত ঘনত্বে মাছ চাষ করলে এ রোগ বেশী দেখা যায়। পুরাতন পুকুর এবং পঁচা কাদা বেশী থাকলে এ পরজীবির সংক্রমনের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

রোগের লক্ষণ

- উকুন বা পরজীবি মাছের দেহে, পাখনায় লেগে থাকতে দেখা যায়।
- মাছের গায়ে ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও রক্তক্ষরণ হয়।
- উকুন পাখনায় ও মাংশপেশীতে হুল ফুটিয়ে রক্ত শোষণ করে।
- আক্রান্ত স্থলের চারপাশ লালচে বর্ন ধারন করে।
- মাছ অস্বাভাবিক গতিতে ছুটাছুটি করে এবং শক্ত কিছুতে গা ঘষতে থাকে।

- আক্রান্ত মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায়।
- ক্ষতস্থানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমনের পথ সুগম করে দেয়।

সাদা দাগ রোগ

এ রোগ কার্পজাতীয় মাছে বেশী দেখা যায়। সাধারণত: এককোষী পরজীবি দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে।

রোগজীবাণু

ইকথায়োপথিরিয়াস মালটিফিলিস (*Ichthyopthirius multifilis*) নামের এককোষী পরজীবি এ রোগ ঘটায়।

রোগের বিস্তার

রুইজাতীয় মাছে এ রোগের বিস্তার বেশী দেখা যায়। পুকুরে পোনার ঘনত্ব বেশী হলে এ রোগ বেশী সংক্রমিত হয়। স্বাদু ও আধা-লবনাক্ত পানির জলাশয়ে সাদা দাগ রোগ পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে ও বসন্তকালে এ রোগ বেশী দেখা দেয়। এ রোগের তীব্রতার মাত্রা ২৫-২৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। জলাশয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এ রোগের একটি অন্যতম সহায়ক উপাদান।

রোগের লক্ষণ

- মাছের ত্বক, লেজ ও পাখনায় সাদা সাদা গোলাকার দাগ দেখা যায়।
- ফুলকায় বা গায়ে সিস্ট দেখা যায়।
- গায়ের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায় এবং স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারায়।
- রোগের তীব্রতা খুব বেশী হলে মাছের ত্বক সাদা ঝিল্লিতে ঢাকা পড়ে যায়।
- মাছ দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেয় এবং কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে।
- মাছ পানির উপর দীর্ঘ সময় ভেসে থাকে এবং আক্রান্ত মাছের পাখনা মুড়িয়ে যায়।
- মাছ অলসভাবে চলাফেরা করে এবং খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখায়।
- আক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যায়।

কৃমিরোগ

কৃমিজাতীয় পরজীবি মাছের অন্ত: এবং বহি:পরজীবি হিসেবে রোগের সৃষ্টি করে।

এটি একটি বহুকোষী পরজীবিঘটিত রোগ। বিভিন্ন প্রজাতির নেমাটোড, সেসটোড এবং জোকের সংক্রমণে মাছের কৃমিজাতীয় রোগ সৃষ্টি হয়। কৃমিজাতীয় পরজীবি মাছের অন্ত: এবং বহি:পরজীবি হিসেবে রোগের সৃষ্টি করে। কৃমিজাতীয় রোগের মধ্যে ড্যাকটাইলোগাইরোসিস এবং গাইরোড্যাকটাইলোসিস রোগসমূহ চাষযোগ্য মাছে বেশী দেখা যায়।

ড্যাকটাইলোগাইরোসিস

এ রোগ গিল ফ্লুক বা ফুলকা কৃমি রোগ নামেও পরিচিত।

রোগজীবাণু

ড্যাকটাইলোগাইরাস গণের কয়েকটি প্রজাতি এই রোগের সৃষ্টি করে। যেমন- ড্যাকটাইলোগাইরাস ল্যামিলেটাস (*Dactylogyrus lamellatus*), ড্যাকটাইলোগাইরাস ভ্যাসটেটর (*D. vastators*), ড্যাকটাইলোগাইরাস এরিসটিকথিস (*D. aristicthys*)।

রোগের বিস্তার

এ রোগ আতুর ও লালন পুকুরে বর্ষা ও শীতকালে বেশী দেখা যায়। মৃগেল, শোল, টাকি ও মাগুর মাছ এ রোগ দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়। পোনা মাছে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করলে এ রোগটি দেখা দিতে পারে।

রোগের লক্ষণ

- মাছের ফুলকা ফুলে যায় ও ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়।
- ফুলকার ওপরে স্বচ্ছ ঝিল্লি আবরণ তৈরি করে।
- আক্রান্ত মাছের শ্বাস-প্রশ্বাস এর হার বেড়ে যায়।
- মাছ অস্থিরতার সাথে লাফালাফি করে।
- মাছের ফুলকা ও দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- মাছের রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- মাছের দেহে অধিক বিজল সৃষ্টি হয়।
- মাছ দূর্বল হয়ে যায় এবং খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখায়।
- মাছ খুব ধীর গতিতে সাঁতার কাটতে থাকে।
- আক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যায়।

গাইরোড্যাকটাইলোসিস

এ রোগ স্কিন ফ্লুক বা ত্বক কৃমি রোগ নামেও পরিচিত।

রোগজীবাণু

গাইরোড্যাকটাইলাস গণের কয়েকটি প্রজাতি (*Gyrodactylus*) এই রোগের সৃষ্টি করে।

রোগের বিস্তার

কার্প জাতীয় মাছের পোনা এই রোগ দ্বারা বেশী সংক্রমিত হয়। শোল, টাকি, মাগুর ও মৃগেল জাতীয় মাছে এ রোগ দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এই রোগ বেশী দেখা যায়। এই রোগের পরজীবি মাছের ত্বক ও ফুলকা আক্রান্ত করে।

রোগের লক্ষণ

- পরজীবি মাছের ত্বকের ওপর বসে রক্তশোষণ করে এবং দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- ক্ষতস্থানে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সহজেই সংক্রমন হতে পারে।
- আঁইশ ফুলে যায় ও লালচে বর্ণ ধারন করে।
- মাছ কোন শক্ত বস্তুর সংস্পর্শে এলে গা ঘষে।
- মাছের বর্ণ ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- আক্রান্ত মাছ স্বাভাবিক উজ্জ্বল্য হারায়।
- মাছের দেহে অবসন্নতা দেখা দেয়, এলোমেলো সাঁতরাতে থাকে এবং লাফালাফি করে।
- মারাত্মক আক্রান্ত মাছের চোখ ঘোলা হয়ে যায় ও মাছ অন্ধ হয়ে যায়।
- মাছ খাদ্য গ্রহণে অনিহা প্রকাশ করে।

অপুষ্টিজনিত রোগ

মাছ যেসব খাদ্য গ্রহণ করে সেসব খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে, যা থেকে মাছের দেহে পুষ্টি সরবরাহ হয়। এই পুষ্টি উপাদানসমূহকে প্রধানতঃ ৬ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা- (ক) আমিষ, (খ) শর্করা, (গ) চর্বি, (ঘ) ভিটামিন, (ঙ) খনিজ লবণ

এবং (চ) পানি। মাছের খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের স্বল্পতায় অথবা অভাবে মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় যা বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়।
মাছের অপুষ্টিজনিত রোগকে প্রধানত: দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ ও খ) খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ।

ক) ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

- ভিটামিন- A এর অভাবে মাছ অন্ধ হয়ে যায়, মাছের চোখ ফুলে যায়।
- ভিটামিন- D এর অভাবে মাছের কিডনি ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংস হয় এবং হাড় বাঁকা রোগ দেখা দেয়।
- ভিটামিন- E এর অভাবে শরীরে তরল পদার্থ জমা হয় এবং মাছের বর্ণ কালো হয়।
- ভিটামিন- K এর অভাবে মাছের মাংশপেশীতে রক্তক্ষরণ ঘটে এবং ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে অধিক সময় লাগে।
- ভিটামিন- B_1 বা থায়ামিন এর অভাবে মাছের ঐচ্ছিক পেশী অবশ হয়ে যায়। ফলে মাছের মৃত্যু ঘটে। চোখের কর্ণিয়া অস্বচ্ছ হয়।
- ভিটামিন- B_3 এর অভাবে মাছের বক্ষ গহবরে পানি জমে। ক্ষুধামন্দা ও স্নায়ু দুর্বলতা দেখা দেয়।
- ভিটামিন- B_5 বা পেন্টোথেনিক এসিড এর অভাবে মাছের ত্বক ও ফুলকায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- ভিটামিন- C এর অভাবে মাছের অস্থি ও কাটার অস্বাভাবিক গঠন দেখা দেয় ও ক্ষতস্থান শুকাতে দেরি হয়।

খ) খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ

- ক্যালসিয়ামের অভাবে মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, হাড় ও কঙ্কাল গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- খাদ্যে জিঙ্কের অভাবে মাছের চোখে ছানি পড়তে পারে।
- ফসফরাসের অভাবে মাছের হাড় ও কঙ্কাল গঠন বাধাগ্রস্থ হয় এবং মাছের বিপাক ক্রিয়া ব্যহত হয়।
- খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা হ্রাস পায় ফলে গলগন্ড রোগ দেখা দেয়।

সারমর্মঃ

মাছ চাষের ক্ষেত্রে পরজীবিঘটিত রোগের আক্রমন অণুজীব সংক্রমিত রোগের চেয়ে বেশী। মাছের পরজীবিঘটিত রোগের মধ্যে আরগুলোসিস, সাদা দাগ রোগ, মিক্সোবোলিয়াসিস, ট্রাইকোডাইনিয়াসিস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ড্যাকটাইলোগাইরাস ও গাইরোড্যাকটাইলাস নামক মাছের কৃমিজাতীয় পরজীবি রোগ দেখা যায়। পরজীবিঘটিত রোগ মাছের ত্বক ও ফুলকাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ত্বক ও ফুলকায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং রক্তক্ষরণ হয় ফলে আক্রান্ত মাছ মারা যায়। দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের জন্য মাছ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহন করে। মাছের খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন A, D এবং K এর অভাবজনিত কারনে মাছের অন্ধত্ব এবং হাড় বাঁকা রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন- B এর অভাবে ক্ষধামন্দা, স্নায়ু দুর্বলতা, রক্ত শূন্যতা এবং ত্বক ও ফুলকার ওপর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মাছের খাদ্যে আমিষের স্বল্পতায় মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি পরজীবিঘটিত রোগ নয়?
ক) আরগুলোসিস
খ) সাদা দাগ রোগ
গ) উদর রোগ
ঘ) কৃমি রোগ

২। কোনটি আরগুলোসিসের লক্ষণ নয়?
ক) মাছ দ্রুত ও অবিশ্রান্তভাবে সাঁতার কাটে
খ) মাছের পেট ফুলে যায়
গ) মাছের রক্তশূন্যতা দেখা দেয়
ঘ) ত্বক লালচে বর্ণ ধারন করে

৩। ড্যাকটাইলোগাইরাস সাধারনভাবে কী নামে পরিচিত?
ক) ত্বক কৃমি
খ) ফুলকা কৃমি
গ) আংটা কৃমি
ঘ) মাছের উকুন

৪। সাদা দাগ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় কত তাপমাত্রায়?
ক) ২৫-২৬° সেলসিয়াস
খ) ২৮-৩০° সেলসিয়াস
গ) ৩১-৩২° সেলসিয়াস
ঘ) ৩৫-৩৬° সেলসিয়াস

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। খ ৩। খ ৪। ক